দৈনিক সংবাদ
তারিখ 28 APR 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

হালচাল

দর্শক

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ ও শিক্ষক-অভিভাবকদের এক সভায় শিক্ষায়তনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বলেছেন, লেখাপড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া সমস্যার সমাধান নয়। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটির সঙ্গে সবাই একমত হবেন। দেশের সকল অভিভাবকের সাধ্য নেই যে নিজ নিজ সন্তানকে পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেয় এবং তার কোন যৌক্তিকতাও নেই। আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সরকারকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বৈঠকে কতগুলো মূল্যবান সুপারিশ এসেছে যা বাস্তবায়ন করা হলে আমাদের বিশ্বাস পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়া সম্ভব। এসবের মধ্যে রয়েছে সময়মত ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করে সেশন জট নিরসন, খেলাধুলা ও সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি, ছাত্রাবাসগুলোতে আসন বন্টনে দলীয় বিবেচনা বাদ দিয়ে মেধাকে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ, বহিরাগত বা অছাত্রদের অবস্থান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা, আবাসিক হলে রোলকল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন ইত্যাদি।

সকলেই স্বীকার করবেন যে অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চায় এবং অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র, প্রধানত অছাত্ররা, সন্ত্রাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অস্ত্রধারীদের সম্পর্কে ভয়ভীতি তো আছেই, তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের নানা সমস্যা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সব কিছু মেনে নেয়ার মানসিকতা জন্ম দেয়। কোন দল বা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত না হলে আবাসিক হলে সীট পাওয়া দুঃসাধ্য। ফলে অনেক ভাল ছেলেও মস্তানদের 'সাহায্য' নিতে বাধ্য হয় ও তাদের খপ্পরে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের গাফিলতির দরুন সময়মত ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্রদের মূল্যবান সময় (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিন চার বছর) নষ্ট হয়। হতাশা চরমে পৌঁছায় যখন তারা দেখে শিক্ষাজীবন শেষে কর্মসংস্থানের দরজা বন্ধ, পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীরা নানা উপায়ে টু-পাইস কামাচ্ছে এবং রাজনৈতিক মুরুব্বীদের জোরে 'উপরে' উঠে যাচ্ছে।

কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। আমার পরিচিত একটি ছেলে ক'বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। গ্রামের ছেলে, মফস্বল কলেজ থেকে পাস করে এসেছে। মেধাবী ছাত্র, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যোগ নেই,— ছাত্র ইউনিয়নকে পছন্দ করে আদর্শবাদী সংগঠন হিসেবে, এটুকুই মাত্র রাজনীতির সঙ্গে তার পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি তো হলো, কিন্তু হলে সীট পায় না। না আছে মুরুব্বীর জোর, না সংগঠনের। একদিন এসে ধরলো আমাকে, যে করেই হোক একটা সীটের ব্যবস্থা করতেই হবে, নইলে পড়াশোনা হচ্ছে না। আমি তাকে কোন সাহায্য করতে পারিনি। সে বললো সীট পাওয়া যায়, ভিন্ন সংগঠনে যোগ দিতে রাজি হলে। সূর্যসেন হলে সীট পেতে হলে অমুক সংগঠনে যোগ দিতে হবে। আর সলিমুল্লাহ বা জহুরুল হক হলে সীট পেতে হলে অমুক ভাইকে ধরতে হবে। যার কোনটাই তার পছন্দ নয়। কিছুদিন পর আবার এসে বললো সীট পেয়ে গেছে। কিন্তু প্রার্থিত হলে সীট পেতে গিয়ে তাকে তার চরম অপছন্দের সংগঠনটিতে যোগ দিতে হয়েছে। বহুদিন তার খোঁজ-খবর পাইনি, পরে শুনলাম সেই শান্তশিষ্ট ছেলেটি নাকি রীতিমত মস্তানে পরিণত হয়েছে। কাকে দোষ দেবেন?

আমি একটি মেয়েকে চিনি, খুবই ভাল ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে পড়তো। তার অনার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তারই এক বান্ধবী বিদেশ থেকে ব্যারিস্টারি ও এলএলএম পাস করে ফিরে এসেছে। জীবনের মূল্যবান চার চারটি বছর অপচয়। এর জন্য কে দায়ী?

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির একটি সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। তখন এরশাদ আমল। এরশাদবিরোধী আন্দোলন যেমন তুঙ্গে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনের তোয়াক্কা না রেখে সরকারী নির্দেশে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার ধুম। একজন অধ্যাপক বন্ধু এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। এ ক্ষোভ আমাদের সবারই ছিল। কিন্তু শুধু এটাই কি ছাত্রছাত্রীদের সময় নষ্টের জন্য দায়ী? অধ্যাপক বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সময়মতো বেরোয় না কেন? আমাদের সময়ে তো তিন চার মাসের মধ্যে ফল বেরিয়ে যেত, এখন এত দেরি হয় কেন? এটাও কি সরকারের দোষ? বন্ধুটি কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না।

আমার এক ছেলেবেলার বন্ধু, পেশায় প্রকৌশলী। তার ছেলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। একদিন বিকেলে দেখলাম, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ক্লাস থেকে ফিরছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি বাবা, লেখাপড়া কেমন চলছে? ছেলেটি জবাব না দিয়ে মুখ ম্লান করে ভেতরে চলে গেল। ওর বাবা বললো, আরে না, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হতে তো আরও এক বছর দেরি। এতদিন বসে থেকে কি করবে, তাই জাহাঙ্গীরনগরে ফের ভর্তি করে দিয়েছি। আসা-যাওয়াটা তো করুক, অন্তত একটা শৃংখলার মধ্যে থাকবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হলে ওখানেই যাবে। এই তরুণ ছেলেটির তিক্ত হতাশা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আঁচ করতে পারেন কি?

আরেকটি মেধাবী ছেলের কথা বলি। এ-ও গ্রামের ছেলে, আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। অনেক আশা-ভরসা নিয়ে স্কুল-শিক্ষক বাবা ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছেলে পাস করে বেরোলে চাকরির অভাব হবে না, সংসারের অনটন ঘুচবে। পাস অবশ্য খুব ভালভাবেই করে বেরুলো, কিন্তু চাকরি কোথায়? ওদের আগের বছর পাস করা প্রকৌশলীরাই বেকার বসে আছে। বেশ কিছুদিন ঘোরাফেরা করে শেষ পর্যন্ত গত বছর আবার ভর্তি হয়েছে এমবিএ'তে। প্রকৌশলী হয়ে চাকরি পেল না, এমবিএ হয়ে যদি পায় এই আশায়। আমরা যারা কথায় কথায় নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের সমালোচনা করি, তারা তাদের হতাশার খবর রাখি না। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীদের প্রেম বিয়ে ও হতাশা সম্পর্কে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করেছিল। সেখানে দেখা গেল অনেকেরই অভিমত, সময়মতো ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ এবং শিক্ষাজীবনশেষে মোটামুটি একটা চাকরির নিশ্চয়তা থাকলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস এমনিই দূর হয়ে যেত।

চাকরির সমস্যা না হয় বুঝলাম অত্যন্ত জটিল, অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে করার কিছু নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও স্বৈরাচার আমল থেকে এমন একটা 'সন্ত্রাসী তোষণ' কালচার গড়ে উঠেছে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেয়া বৃথা। একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের কমবেশি সমীহ করে চলেন, বিশেষত তাদের গায়ে যদি রাজনৈতিক লেবেল সাঁটা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যখন সন্ত্রাস চলে, গোলাগুলি বোমাবাজিতে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন পুলিশের নীরব দর্শকের ভূমিকা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আইন-শৃংখলার প্রতি আর যাই হোক শ্রদ্ধা জাগায় না। তরুণমানসে সন্ত্রাসীরা ঘৃণার পাত্রের বদলে বরং 'বীর'-এর আসন দখল করে নেয়। কিম্বা সন্ত্রাসীরা যখন প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে দাবি করে যে তারাই অমুক 'অযোগ্য' ব্যক্তিকে উপাচার্যের আসনে বসিয়েছে এবং এর বিপরীত কোন প্রমাণ সাধারণ ছাত্ররা পায় না তখন তারা অসহায় বোধ করে। উপরের দু'টি অবস্থার কোনটিই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুকূল নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও স্বৈরাচার আমল থেকে এমন একটা 'সন্ত্রাসী তোষণ' কালচার গড়ে উঠেছে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেয়া বৃথা। একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের কমবেশি সমীহ করে চলেন, বিশেষত তাদের গায়ে যদি রাজনৈতিক লেবেল সাঁটা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যখন সন্ত্রাস চলে, গোলাগুলি বোমাবাজিতে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন পুলিশের নীরব দর্শকের ভূমিকা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আইন-শৃংখলার প্রতি আর যাই হোক শ্রদ্ধা জাগায় না। তরুণমানসে সন্ত্রাসীরা ঘৃণার পাত্রের বদলে বরং 'বীর'-এর আসন দখল করে নেয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের সবচেয়ে বড় অন্তরায় সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। সরকারী বা সরকারবিরোধী নির্বিশেষে প্রায় সব দলের সম্পর্কেই সন্ত্রাসী পোষণের অভিযোগ কমবেশি সত্য। বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটাশ্রিত সন্ত্রাসীদের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। অনেকের 'ডবল এজেন্ট' সুলভ চরিত্রও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সরকারী ও সরকারবিরোধী দলগুলো যারা পরিচালনা করেন তাদের সবারই স্ব স্ব দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের কাজকর্ম সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা সন্ত্রাসীদের পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। এক গোষ্ঠীকে বের করেন তো অন্য গোষ্ঠীকে লালন করেন। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতিতে যাই বলুন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা এ সম্পর্কে অবহিত এবং এর ফলে সন্ত্রাস দমনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনাকালে একজন সাংসদ প্রস্তাব করেছিলেন, সরকারীদল বিরোধীদল-আশ্রিত এবং বিরোধীদলসরকারীদল-আশ্রিত সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করুক এবং তাদের গ্রেফতার করা হোক, সন্ত্রাস দমন হতে সময় লাগবে না। এতটা যদি না-ও হয়, সরকারই দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীকে পক্ষপাতহীনভাবে আটক করুন, আমাদের মনে হয় তাতেও কাজ হবে। কারা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, খুন-খারাবিতে লিপ্ত,— কারা চাঁদাবাজ, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে বা বাইরে ঠিকাদার ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে তা পুলিশ বাহিনীরও অগোচরে থাকার কথা নয়। তাদের স্বাধীন ও যথার্থই নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হলেও পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব। মোটকথা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে যদি আমরা সত্যিই জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে সরকারী ও বিরোধী উভয়পক্ষকে দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সন্ত্রাসীদের পোষকতা দান বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের দায়িত্ব নিতে হবে দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীকে নিরস্ত্র ও নিষ্ক্রিয় করার। শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে সহযোগিতা পেতে অসুবিধা হবে না। আর তা না হলে বৈঠক হবে, আলোচনা হবে, ছাত্র-শিক্ষকদের 'রাজনীতি'কে দোষারোপ করা হবে, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ রদবদলের অজুহাত খোঁজা হবে- কাজের কাজ কিছু হবে না।